মাফিয়া - অন্যরূপে

সুব্রত রায়

জানুয়ারী ৫, ২০১১

প্রিয় মহাশয়,
গত বছর সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে আমি আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশের জন্য তিনখানি প্রবন্ধ পাঠিয়েছি। অদ্যাবধি এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আপনাদের মতামত বা মূল্যায়ন আমার হস্তগত হয়নি। সামনের মে মাসে আমার ৭৫ বছর পূর্ণ হবে। আমি স্থির করেছি, মে মাসের শেষে আমি কর্মজীবন থেকে অবসর নেব। এই অবস্থায় মার্চ মাসের মধ্যে যদি আপনাদের মতামত জানতে না পারি, তবে আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কাজ গুটিয়ে ফেলার জন্য আমি এপ্রিল ও মে মাস রেখেছি। তাই আমার প্রবন্ধগুলির মূল্যায়ন মার্চ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে করতে পারলে আমি বিশেষভাবে বাধিত হবো।

বিনীত,
অশোক কুমার মিত্র

মেলটা পড়ে কম্প্যুটার স্ক্রিন থেকে চোখ তুলে প্রফেসর রিচার্ড গিলবার্ট মারে জালনা দিয়ে দূরের গাছগুলির দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন। অস্ফুটে বললেন - মিত্র তাহলে অবসর নিচ্ছেন। দু-বার নিজের ঘরের মধ্যে পায়চারি করলেন। তারপর ইন্টারকম তুলে বললেন - জন, তোমাকে একটা মেল এখুনি পাঠিয়েছি। মিত্রর পেপারগুলি কি অবস্থায় আছে দেখো তো। জন বললো - আপনার মেলটা পেয়েই আমি নিজেই দেখেছি। যথাসময়ে রিভিউর জন্য পাঠানো হয়েছে। কোনও উত্তর আসেনি। সকলকে তাড়া দেওয়া হয়েছে। তাও প্রায় মাস খানেক হয়ে গেল। তুমি একটা কাজ করো। পেপারগুলি ছেপে আমাকে পাঠিয়ে দাও - মারে বললেন।

মারে বারান্দার কফি মেশিন থেকে একটা কালো কফি নিয়ে পেপারগুলি পড়তে সুরু করলেন। ঘণ্টা তিনেক পর আবার ইন্টারকম তুলে জনকে ডাকলেন - জন, তুমি কি কষ্ট করে আমার ঘরে আসবে? মার্থা যদি ফাঁকা থাকে তবে ওকেও আসতে বলো। জন, মারে বলতে সুরু করলেন, আমি পেপারগুলি দেখেছি। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হিসাবে আমার কিছু বিশেষ ক্ষমতা আছে। আমি কখনো তা প্রয়োগ করিনি। মিত্রর প্রতি সম্মান দেখাতে এই তিনটা পেপার বিনা মূল্যায়নে সামনের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। মার্থা, তুমি আমার নাম করে মিত্রকে জানিয়ে দাও যে ৫০ বছরের বেশি এই পত্রিকার সঙ্গে মিত্রর সম্পর্কে কথা স্মরণ রেখে তাঁর এই শেষ তিনটা পেপার কোন রকম মূল্যায়ন ছাড়া প্রকাশ করা হচ্ছে। আরও জানিয়ে দাও এ বছরের শেষে মিত্রর সম্মানে আমরা এই পত্রিকার একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করব এবং

বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে পেপার চেয়ে আমন্ত্রণ জানাবো। মিত্রর জীবন ও কাজের মূল্যায়ন করে প্রথম পেপারটা আমি নিজেই লিখবো।

- আমি বরাবর লক্ষ্য করেছি মিত্রর পরে আপনার একটা দুর্বলতা আছে - জন মন্তব্য করলো।

- দুর্বলতা? শ্রদ্ধা? ভক্তি না ভালোবাসা? ঠিক কোনটা আমি জানিনা। যে কারণে আমি বিখ্যাত সেই মারে ইন-ইকুয়ালিটি, মারে লিমিট অনায়াসে মিত্রর নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারতো।

- সে কি? এই কাজের জন্য আপনি নোবেল প্রাইজ় পেয়েছেন।

- ঠিক তাই। ঐ আলমারির উপরের তাকে ডান দিকের কোণের বইটাতে আমার নোবেল-বক্তৃতা আছে। ওটা পড়ে দেখতে পারো। ওতে অবশ্যই সব কথা লেখা নেই। আমরা দু-জন আর রুথ ছাড়া সব কথা বোধহয় আর কেউ জানে না।

- আমার খুব শুনতে ইচ্ছা করছে।

- বেশ তো আজ তুমি ও মার্থা আমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে এসো। খেতে খেতে কথা বলা যাবে।

(২)

মারে সুরু করলেন - আমি তখন কর্নেলে প্রি-ডক। এমন সময় ছ-মাসের জন্য ভিজিটিং হয়ে এক ভারতীয় অধ্যাপক এলেন। ভারতীয় অধ্যাপক, কি জানি কেমন এই সব ভাবতে ভাবতে ক্লাসে গেলাম। ঠিক সকাল আটটার সময় ক্লাস সুরু হলো। দু-একদিনের মধ্যে বুঝলাম অন্যদের চেয়ে ইনি কত আলাদা। তখন আমি দোটানায় ভুগছিলাম। একবার ভাবছিলাম বিজ্ঞান ছেড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চলে যাব। মিত্রকে দেখে মত পালটালাম। প্রায় মাস ছয়েক পর একদিন ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি মিসেস কিং আমাকে ডেকে বললেন, তোমাকে মিত্র খোঁজ করছিলেন। মিত্রর ঘরে তখুনি গেলাম। মিত্র বললেন, রবিবার আমি চলে যাচ্ছি। আমার এই বইগুলি তুমি যদি গ্রহণ করো তাহলে আমি খুশি হবো। কাল দুপুর বেলায় তোমার কি সময় হবে? তাহলে আমরা একসঙ্গে লাঞ্চ করতে পারি। সম্ভব হলে রুথকে নিয়ে এসো। মিসেস মিত্রও থাকবেন। আমি একটু লজ্জা পেলাম। বুঝলাম রুথের সঙ্গে আমি যে ডেট করছি সেটা মিত্র লক্ষ্য করেছেন। খাওয়ার টেবিলে অনেক গল্প হলো। বাড়ি যাওয়ার আগে মিত্র বললেন, তোমার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। তবে পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নেই।

যথা সময়ে পি-এইচ-ডি ডিগ্রি পেলাম। তখন দ্বিতীয় পোস্ট-ডক করছি আর চাকরি খুঁজছি। প্রফেসর মিলার একদিন আমাকে ডেকে বললেন, ডিক বম্বের টাটা ইন্সটিটিউটে আমার একটা কনফারেন্সে যাবার কথা ছিলো। গত সপ্তাহে মিসেস মিলারের হার্ট ব্লক ধরা পড়েছে। তোমার অসুবিধা না থাকলে আমার বদলে তুমি চলে যাও। ওখানে অনেকের সঙ্গে তোমার দেখা হবে। কিছু সুবিধা হতে পারে।

কনফারেন্সের আগের দিন মিত্রর সঙ্গে দুপুর বেলায় ওয়েস্ট ক্যান্টিনের দরজায় দেখা হয়ে গেলো। কেমন আছ রিচার্ড? গত মাসে তোমার পেপারটা পড়লাম। ভালো কাজ হয়েছে। কি করছো এখন? আমি বললাম, নতুন প্রবলেম আর চাকরির খোঁজ করছি। ওয়েস্ট ক্যান্টিনের বাইরে সোফায় বসে কখন যে লেখাপড়ার মধ্যে ঢুকে পড়লাম বুঝতে পারলাম না। খেয়াল হলো যখন ডিনারের ডাক পড়লো। ততক্ষণে ঘণ্টা ছয়েক পার হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে মিত্র প্রায় চল্লিশ পাতা অঙ্ক কষে ফেলেছেন। বললেন, এটা ভেবে দেখতে পার। ফিরে আসার পর মিলার জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হলো কনফারেন্স? আমি সত্যি কথাই বললাম। কনফারেন্সের আগের দিন মিত্র একটা প্রবলেমের কথা বললেন। সেটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে এ-কদিন চলে গেল। মন দিয়ে কনফারেন্স শুনিনি। মিলার বললেন, তাহলে কষে ফেলো। তারপর টানা ন-মাস দিনে প্রায় ১৪/১৫ ঘণ্টা কাজ করতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় কাজটা শেষ হলো। মিত্রকে ফোন করলাম। মিত্র দু-চারটে প্রশ্ন করলেন। আর দু-তিনটে নম্বর জানতে চাইলেন। বললেন, পেপারটা লিখে ফেলো। প্রায় কুড়ি দিন ধরে পেপারটা লিখলাম। বেশ বড় পেপার। টাইপ করার পর ৬৫ পাতা। মিত্রকে পাঠিয়ে দিলাম। উত্তর পেলাম, পেয়েছি। দেখে পাঠাচ্ছি। পনেরো দিন পর পেপারটা ফেরত পেলাম। সমস্ত পেপারটা প্রায় নতুন করে লেখা। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে। খানিকটা ছোট করে দিয়েছেন। দু-একটা ইকোয়েশনে ফ্যাক্টর ছেড়ে গিয়েছিলাম সেগুলি বসিয়ে একটা ছোট চিঠি, আমার নামটা থাকবে না। এটা তোমার কাজ। শুধু তোমার নাম থাকবে। পেপারটা পাঠিয়ে দাও। পরে শুনেছিলাম একজন রেফারি প্রফেসর কুপার মিত্রর অফিসে এসে বলেছিলেন, মারের পেপারটা দু-এক জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। তোমাকে পেপারের শেষে ধন্যবাদ দিয়েছে। তাই মনে হয় তুমি এ কাজটার সঙ্গে পরিচিত। আমাকে একটু সাহায্য করবে?

যাইহোক পেপারটা বের হলো। দেখলো অনেকেই। তবে খুব বেশি কেউ পড়লো বলে মনে হয় না। কয়েকমাস পরের কথা। শিকাগোতে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। মিত্রকে একটা সান্ধ্য-বক্তৃতা দিতে বলা হলো। এখনো মনে আছে মিত্র সুরু করলেন, কয়েকমাস আগে প্রকাশিত রিচার্ড মারের একটা পেপারের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বলে আমার পেপারের মূল কথাটা বললেন। মিত্রই নামকরণ করলেন মারে ইন-ইকুয়ালিটি ও মারে লিমিট। আমি আমার পেপারের কথা মিত্রর কাছ থেকে শুনলাম, এমন সব কথা যা আমি নিজেও কোনদিন ভেবে দেখিনি। সেদিন বুঝতে পারলাম কাজটা মোটামুটি মিত্রর করা ছিল। না হলে এত খুঁটিনাটি জানা সম্ভব ছিলো না। ডিনারের সময় আমাকে ডেকে বললেন, State University of New York, Albany-র প্রফেসর মূলারকে একটা সিভি পাঠিয়ে দাও। আমার নাম রেফারি হিসাবে দিয়ে দিও। মাস দুয়েক পর SUNY থেকে আমার ডাক পড়লো। প্রফেসর মূলার বললেন, তোমার সাম্প্রতিক কালের কাজটা নিয়ে একটা সেমিনার দাও। মিত্র লিখেছেন তোমার এই কাজটা পদার্থবিজ্ঞানের একটা মাইলস্টোন হিসাবে গণ্য হবে। চাকরি হয়ে গেল।

এর পনেরো বছর পরের কথা। একদিন ভোর বেলায় ফোনটা বাজতে লাগলো। রুথ ঘুম চোখে ফোনটা ধরে বললো, বিদেশের ফোন। আমি ফোন ধরতে ওদিক থেকে বললো, রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছে যে এ বছর পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজের জন্য রিচার্ড মারে মনোনীত হয়েছেন... । আমি ভাবলাম মিত্রকে ফোন করি। রুথ বললো, এখন মিত্রর ওখানে শেষ রাত। তার চেয়ে চলো না মিত্রর ওখানে চলে যাই। কথাটা আমার মনে ধরলো। ছেলেকে রুথের মার কাছে রেখে আমরা যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছলাম তখন সকাল দশটা বাজে। টেলিভিশনে দেখলাম নোবেল প্রাইজের খবরটা বলছে। মাঝখানে প্লেন বদল করে যখন লস এঞ্জেলেসে পৌঁছলাম তখন বিকেল হয়ে গেছে। মিত্র কেক, পেস্ট্রি খেতে খুব ভালবাসেন। বড় একটা কেক কিনলাম। মিত্রর বাড়ি মাধবী-ভিলার দরজায় যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মিত্রর বাড়ির চারপাশে অনেকটা জায়গা। সামনে সবুজ ঘাসের লন, তার মধ্যে ফুলের বাগান। বাড়ির পিছন দিকে তরকারির বাগান। গেট খুলে বেশ খানিকটা নুড়ি পাথরের পথ। বাড়িটা দোতলা। দোতলার সামনের দিকটায় বিরাট বারান্দা, তার পিছনে বসবার জায়গা, আর তারও পিছনে শোবার ঘর। বিকেলে সাধারণত মিত্র আর মিসেস মিত্র ওখানে বসে চা খান। আমাদের দেখতে পেয়ে দুজনে বারান্দার রেলিং-এর ধারে চলে এলেন। মিসেস মিত্র দৌড়ে একতলায় নেবে দরজা খুলে বাড়ির বাইরে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। দোতলায় যেতে মিত্র বললেন, CNN-এর খবর শুনে সকাল থেকে অনেকবার তোমাকে ফোনে চেষ্টা করছি। কিন্তু ফোন বেজে যাচ্ছে। এখন কারণটা বুঝতে পারছি। এই কথা বলে মিত্র ভিতরের ঘরের মধ্যে থেকে একটা ছোট বাক্স নিয়ে এলেন। বললেন, এটা একটা মঁ ব্লাঁ কলম। তুমি এটা ব্যবহার কোরো। এই কলমটা প্রফেসর গডার্ড আমাকে দিয়েছিলেন, যখন আমি হার্ভার্ড ছেড়ে প্রিন্সটনে যাই। নোবেল প্রাইজ নেবার সময় প্রফেসর গডার্ড এই কলমটা নিয়ে স্টকহোমে গিয়েছিলেন।

একটানা অনেকক্ষণ কথা বলে মারে একটু থামলেন। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে আবার সুরু করলেন। তোমাদের দেখাবার জন্য কলমটা নিয়ে এসেছি। আজও যখন গভীর সমস্যায় পড়ি তখন এই কলমটা বার করি। এই কলমটা হাতে নিলে কেন জানিনা সমস্যার জট খুলে যায়। তোমরা এই কলমটা হাতে নিয়ে দেখতে পারো। এতে গডার্ড আর মিত্রর স্পর্শ লেগে রয়েছে।

(৩)

ইংরেজরা ১৯৪৭ সালে অগাস্ট মাসে ভারত ছেড়ে যাবার সময় দেশটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে দিয়ে গেল। নতুন এক শ্রেণী তৈরি হলো, যাদের নাম উদ্বাস্তু। এরা নিজেদের এতকালের বাড়িঘর ছেড়ে নিরাপদ আস্তানার সন্ধানে অন্য এক অপরিচিত জায়গায় প্রায় কপর্দকহীন হয়ে আশ্রয় নিলো। অনিরুদ্ধ ও রাধারানী মিত্র তাদের দুই ছেলেমেয়ে অশোক ও মাধবীলতাকে

নিয়ে পূর্ববাংলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে কলকাতার শিয়ালদহ স্টেশনে হাজির হলো। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দক্ষিণে তখন প্রচুর খালি জায়গা ছিল। দিনের বেলায় সেখানে শেয়াল ঘুরে বেড়াত। মিত্র ও আরও কয়েকটি পরিবার সেখানে বাঁশ আর টালি দিয়ে কোনরকমে একটা মাথা গোঁজার জায়গা করে নিলো। অনিরুদ্ধ গ্রামের স্কুলে ইংরাজি পড়াতেন। কলকাতায় বহু চেষ্টা করেও একটা স্কুলে চাকরি জোগাড় করতে পারলেন না।

ক্রমে তাঁর সঞ্চয় যখন শেষ হওয়ার মুখে, রাধারানী তিন বাড়িতে রান্নার কাজ নিলেন। সকালে একটা বিকেলে দুটো। এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ছোট্ট মেয়ে মাধবীলতা সহ্য করতে পারলো না। দু-দিনের রক্ত আমাশায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিলো। একটা কাজের জন্য অনিরুদ্ধ যখন হন্যে হয়ে পায়ে হেঁটে কলকাতা এ-মাথা ও-মাথা করছেন তখন একদিন তাঁর গ্রামের স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র অরুণাভর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল মনুমেন্টের তলায়। অরুণাভ তখন কলকাতা কর্পোরেশনের একজন কর্তা। সে অনিরুদ্ধকে কলকাতা কর্পোরেশনের ক্যাশ বিভাগে দৈনিক আড়াই টাকা বেতনের কাজের ব্যবস্থা করে দিলো। অনিরুদ্ধ স্কুলে ইংরাজি পড়ালেও সব বিষয় পড়াতে পারতেন। তাই কিছুদিনের মধ্যে জুটে গেল কয়েকটা প্রাইভেট টিউশন। অনিরুদ্ধ অশোককে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। পরীক্ষার ফল দেখে স্কুলের হেডমাস্টার অশোককে ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। যথা সময়ে অশোক ভালোভাবে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাস করে প্রেসিডেন্সি কলেজে I.Sc তে ভর্তি হলো। তারপর পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে B.Sc পাস করে M.Sc পড়তে গেলো রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে। I.Sc পড়ার সময় থেকে অশোক ছাত্র পড়িয়ে নিজের পড়ার খরচ নিজেই চালাতে সুরু করলো। ইতিমধ্যে অরুণাভ চেষ্টা করে অনিরুদ্ধকে কলকাতা কর্পোরেশনের একটা কেরানীর চাকরি জোগাড় করে দিয়েছে। ফলে মিত্র পরিবার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেলো।

(৪)

ঠিক এগারোটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে প্রফেসর জেরাল্ড গডার্ডকে নিয়ে একটা গাড়ি সাহা ইন্সটিটিউটের দরজার সামনে দাঁড়ালো। লিফটের কাছে এসে গডার্ড বললেন - এ বাড়িতে প্রফেসর সাহার একটা মূর্তি আছে না? গডার্ডের সঙ্গী বললো - একতলা আর দোতলার ল্যান্ডিং-এর মুখে আছে। গডার্ড বললেন - তাহলে হেঁটেই যাওয়া যাক। তোমাদের অডিটোরিয়াম তো দোতলায়। গডার্ড প্রফেসর সাহার মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন। মূর্তির গলায় মোটা রজনীগন্ধার মালা। মালার মধ্যে থেকে বেশ কয়েকটা লাল গোলাপ উঁকি দিচ্ছে। গডার্ড অডিটোরিয়াম ঢুকলেন। প্রথম সারির একেবারে বাঁ-দিকের খালি চেয়ারটায় বসে হাতের ব্রীফকেস খুলে একটা বড় খাম বার করলেন। গডার্ড আজ সাহা মেমোরিয়াল বক্তৃতা দিতে এসেছেন। চেয়ারম্যান, গডার্ড কোথায় পড়াশুনা করেছেন এবং তার কাজের ফিরিস্তি দেওয়ার পর গডার্ডকে আহ্বান করলেন বক্তৃতা সুরু করার জন্য। গডার্ড সাহার সঙ্গে তাঁর প্রথম

সাক্ষাৎকারের কথা স্মরণ করে সাহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তৃতা সুরু করলেন। অডিটোরিয়াম আজ উপচে পড়েছে। বেশ কিছু ছাত্র যারা পরে এসেছে তারা বসতে পারে নি, অডিটোরিয়ামের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। একসময় বক্তৃতা শেষ হলো। হাততালির মধ্যে গডার্ড মাথা নিচু করে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন - আমার হাতে কিছুটা সময় আছে। যদি কারুর কোনো প্রশ্ন থাকে তবে আমি উত্তর দেবার চেষ্টা করতে পারি। বেশ কয়েকটা হাত উঠলো। গডার্ড চতুর্থ সারির দিকে আঙুল তুলে বললেন - এই তরুণ শ্রোতার প্রশ্ন প্রথম শোনা যাক। অশোক উঠে দাঁড়ালো। দুটো প্রশ্ন করলো। গডার্ড মন দিয়ে শুনলেন। চক তুলে নিয়ে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে উত্তর দিতে লাগলেন। উত্তর দেবার পর বললেন - তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এখন দিতে পারছি না। কারণ আমি ওভাবে ভেবে দেখেনি। আমি এর উত্তরটা ভেবে তোমাকে জানাবো। আচ্ছা, তুমি কি করো? অশোক বললো - আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান পড়ি। গডার্ড বললেন - তোমার হাতে যদি সময় থাকে তাহলে তোমার সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই। তুমি কি আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে? অশোক ঘাড় নাড়লো।

অশোক ঘরে ঢুকে দেখলো গডার্ড একটা বড় টেবিলে বসে আছেন। অশোককে ঢুকতে দেখে নিজে উঠে দাঁড়িয়ে বসতে বলে বললেন - আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খেতে নিশ্চয়ই আপত্তি হবে না। অশোক চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো। গডার্ড বললেন - লজ্জা পাচ্ছ কেন? অশোক বললো - লজ্জা পাচ্ছি না। আমি কোনোদিন কফি খাই নি। গডার্ড বললেন - তাই নাকি? আজ একবার চেষ্টা করে দেখো। একজনকে ডেকে বললেন - ওর কফিতে একটু বেশি দুধ দিয়ো। অশোককে বললেন - ভালো না লাগলে এক চুমুক দিয়ে রেখে দিয়ো। তোমার দ্বিতীয় প্রশ্নটা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। মনে হয় আর একটা পেপার লিখে এর উত্তরটা দিতে হবে। অশোকের কাছ থেকে জেনে নিলেন তাদের পাঠ্য বইগুলির নাম। অশোক জানালো সে গডার্ডের লেখা বইও ব্যবহার করে। গডার্ড খুব আশ্চর্য হলেন, বললেন - তাই নাকি। আমার ছাত্ররা বলে বইটা খুব শক্ত। অশোক জানালো সে গডার্ডের বই-এর সব প্রবলেম কষে ফেলেছে। অশোক তার কাঁধের ঝোলা থেকে একটা লম্বা খাতা বার করে বললো - এতে চ্যাপ্টার আটের সব প্রবলেম কষা আছে। গডার্ড বুক পকেট থেকে চশমাটা বের করে চোখে দিলেন। খাতাটা খুলতে খুলতে বললেন - কাগজটা বেশ খসখসে। অশোক বললো - সবচেয়ে কম দামের কাগজ। ৯৬ পাতার দাম তিন আনা। গডার্ড এবার মন দিয়ে কসা প্রবলেমগুলি দেখতে লাগলেন। অশোক বললো - স্যার, ১৭ নম্বর প্রবলেমটার উত্তর মিলছে না। তাই নাকি? আমার বই কি এখানকার লাইব্রেরিতে আছে - গডার্ড জানতে চাইলেন। দু-কপি আছে। একটা রেফারেন্স করে রাখা আছে - অশোক জানালো। গডার্ড ফোন তুলে লাইব্রেরিকে অনুরোধ করলেন বইটা যদি কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে অশোকের সঙ্গে গল্প করতে সুরু করেছেন। বাড়িতে কে আছেন। তারা কি করে। যখন শুনলেন অশোকের একটাও টেক্স্ট বই নেই তখন অবাক হলেন।

গডার্ড তার নিজের বই খুলে প্রবলেমটা ভালো করে দেখলেন। তারপর চক তুলে নিয়ে বোর্ডে প্রবলেমটা করতে সুরু করলেন। অশোক বললো - আমিও এই উত্তরটা পেয়েছি। গডার্ড মনে মনে কি একটা হিসাব করলেন, তারপর বললেন - বইতে ভুল লেখা আছে। আমি একটা রুট পাই বাই টু ফ্যাক্টর ছেড়ে গেছি। গডার্ড ঘুরে দাঁড়ালেন তারপর আস্তে আস্তে অশোককে বললেন - আমি তোমার জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করলে তুমি কি হার্ভার্ডে পি-এইচ-ডি করতে আসবে? অশোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো - আমি আপনাকে আমাদের আর্থিক অবস্থার কথা বলেছি। আমার পক্ষে আমেরিকা যাবার ভাড়া জোগাড় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি ভাবছিলাম যে পরীক্ষায় পাস করে একটা স্কুল বা কলেজে চাকরির চেষ্টা করবো তাহলে আমার মাকে আর কষ্ট করে তিন বাড়িতে রান্নার কাজ করতে হবে না। গডার্ড কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন। তারপর বললেন - আমি যদি আমেরিকা থেকে টিকিট পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করি আর এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে তুমি এখানে যা রোজগার করতে তার চেয়ে বেশি আমেরিকা থেকে বাড়িতে পাঠাতে পারো? অশোক চুপ করে রইলো। গডার্ড বললেন - আমি কি তোমার মা বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারি? অশোক বললো - আমার মা ইংরাজিতে কথা বলতে পারেন না। তাতে কি হয়েছে? তুমি দোভাষীর কাজ করবে - গডার্ড বললেন। বেশ, কাল শনিবার। আমার বাবার অফিস দুটোর সময় ছুটি। আমরা তিনটের মধ্যে এখানে চলে আসবো - অশোক বললো।

টিনের বাক্স থেকে রাধারানী তার একমাত্র বাইরে পরার শাড়িটা বার করেছেন। অনিরুদ্ধ শনি ও রবিবার দাড়ি কামান না। সাহেব ডেকেছেন তাই আজ দাড়ি কামিয়ে অফিসে গেছেন।

গডার্ড উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন আর বসতে বললেন।
- আপনাদের ছেলের কাছে শুনলাম আপনি পূর্ব বাংলার স্কুলে ইংরাজি পড়াতেন। আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করি আর আমার মা আমাকে বিজ্ঞান চর্চায় উৎসাহিত করতেন। যদিও এখন বিজ্ঞান চর্চা আমার পেশা, আমি কিন্তু সাহিত্যকে দূরে সরিয়ে রাখিনি। আমার পড়ার ঘরে সাহিত্যের বই বিজ্ঞানের বই-এর চেয়ে কম নয়। এখনও বছরে আমি একটা দুটো সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখে থাকি। অনিরুদ্ধ বললেন - সময় আর সুযোগের অভাবে আজকাল আর সাহিত্য চর্চা করা হয়ে উঠে না। গডার্ড তার ব্রীফকেস থেকে একটা বই বার করে বললেন - এটি আমার সম্প্রতিকালে প্রকাশিত প্রবন্ধের সংকলন। সময় পেলে পড়ে দেখবেন। বইটা খুলে with compliments লিখে সই করে দিলেন।

রাধারানী আর অশোক চুপ করে বসে ছিলো। গডার্ড অনিরুদ্ধকে বললেন - এবার আপনি দোভাষীর কাজ করুন। আমার কথা আপনার স্ত্রীকে বুঝিয়ে দিন। গডার্ড অশোকের দিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে সুরু করলেন - আপনার ছেলের সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভালো

লেগেছে। আমি আমেরিকার একটি প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি। আমি আপনার ছেলের সঙ্গে কাজ করতে চাই। আপনারা যদি অনুমতি দেন। অশোকের আমেরিকায় থাকার সময় সব দায়িত্ব আমার। রাধারানী বললেন - ঠিক আছে। আমার আপত্তি নেই। আমরা চালিয়ে নিতে পারবো। অশোক তার মার কথা অনুবাদ করে দিলো। গডার্ডের মুখ হাসিতে ভরে গেল। অশোককে জিজ্ঞাসা করলেন - তোমার বাড়ি এখান থেকে কতদূর? অশোক বললো - বাসে একঘণ্টা তারপর পনেরো মিনিট হাঁটতে হয়। গডার্ড বললেন - এরা আমাকে একটা গাড়ি দিয়েছেন। চলো তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। অশোক আর অনিরুদ্ধ মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। অশোক শেষে বলেই ফেললো - আমাদের বাড়ি পর্যন্ত গাড়ি যায় না। আর আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই। গডার্ড বললেন - তাতে কি হয়েছে? একজনকে ডেকে বললেন এই বইগুলি আর থলিটা গাড়িতে তুলে দাও।

সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু পুরোপুরি অন্ধকার হয় নি। গডার্ড জুতো খুলে ঘরে ঢুকলেন। ইতিমধ্যে রাধারানী লণ্ঠন জ্বেলে দিয়েছেন। ঘরের কোনে একটা নড়বড়ে চেয়ার আর টেবিল। অশোকের পড়ার জায়গা। গডার্ড চেয়ারে বসে বললেন - এই বইগুলি আমার উপহার। অনিরুদ্ধের দিকে তাকিয়ে বললেন - কাল আমি ফিরে যাচ্ছি। দেশ থেকে কিছু শুকনো খাবার এনেছিলাম। আপনারা খেয়ে দেখবেন।

(৫)

বোস্টন এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন আর কাস্টমস পেরিয়ে বাইরে এসে অশোক দেখলো গডার্ড দাঁড়িয়ে আছেন। গডার্ড এগিয়ে এসে করমর্দন করে বললেন - দুদিন আমার বাড়িতে থাকবে। তারপর সোমবার তোমার আস্তানায় তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো। আপাতত বাড়িতে গিয়ে ভালো করে ঘুমিয়ে নাও। তারপর কথা বলা যাবে।

গাড়ি চালাতে চালাতে গডার্ড বললেন - তোমার পরীক্ষার ফল খুব ভালো হয়েছে দেখলাম। অশোক বললো - সেটা আপনার জন্য। আপনি যে টেক্স্ট বইগুলি দিয়ে এসেছিলেন সেগুলি আমার খুব উপকারে লেগেছে। তাছাড়া আপনার বক্তৃতার পরদিন স্টেটসম্যান খবরের কাগজে অনেক খবরের মধ্যে একটা খবর ছিলো যে আপনি আমাকে এখানে পড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। তখন আমি একটি ক্লাস টেনের ছেলেকে অঙ্ক পড়াতাম। ঐ খবর পড়ে ছেলেটির বাবা আমাকে প্রস্তাব দিলেন পরীক্ষার আগের তিন মাস ওদের বাড়িতে থেকে আমি পড়াশুনা করতে পারি। আমার মা বাবা আপত্তি করলেন না। একটা ভালো ঘর, ইলেকট্রিক আছে ফলে আমার খুব সুবিধা হলো। ঐ তিন মাস আমার ছাত্রের মা নিজের ছেলের মতন আমাকে যত্নে রেখেছিলেন।

দীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রতীক্ষা শেষ হলো। ঠিক সকাল দশটার সময় পাঁচ জন পরীক্ষকের সামনে অশোক এসে দাঁড়ালো। আজ তাঁর ডিফেন্স ডে। কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর ম্যাগগ্রেগর বললেন - তুমি তোমার কাজটা আমাদের বুঝিয়ে বলো। জীবনের শেষ পরীক্ষার জন্য অশোক গত সাতদিন নিজেকে তৈরি করেছে। চক হাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে অশোক গত পাঁচ বছরের তার কাজের একটা বিবরণ দিলো। গডার্ড চুপ করে বসে রইলেন। বাকি চারজন আরও একঘণ্টা তাকে নানা প্রশ্ন করলেন। এবার প্রফেসর ম্যাগগ্রেগর বললেন - তুমি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবো। মিনিট পাঁচেক পর অশোকের ডাক পড়লো। প্রফেসর ম্যাগগ্রেগর নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন - Congratulation Dr Mitra। অশোক একটু হকচকিয়ে গেলো। দেখলো প্রফেসর গডার্ডের মুখ হাসিতে ভরে গেছে। একে একে সকলের সঙ্গে করমর্দন করলো। প্রফেসর গডার্ড ফিস ফিস করে বললেন - সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে এসো। মেরি তোমাকে ডিনারে নেমন্তন্ন করেছে। ডিনার খেতে খেতে গডার্ড বললেন - অশোক, তোমার এখানে পাঁচ বছর হলো। আমার হাতে প্রজেক্ট আছে। আমি তোমাকে আরও কয়েক বছর রেখে দিতে পারি। কিন্তু সেটা তোমার ক্যারিয়ারের পক্ষে ভালো হবে না। আমি প্রিন্সটনের প্রফেসর বেকারের সঙ্গে কথা বলে রেখেছি। তুমি কালকে তোমার সিভি প্রফেসর বেকারকে পাঠিয়ে দাও। ছেলেটা তাহলে এখান থেকে চলে যাবে? মেরি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। অশোককে আরও অনেকদূর যেতে হবে। এটা ওর পক্ষে ভালো হবে - গডার্ড বললেন।

রবিবারের সকাল। ভোর বেলায় ফোন বাজছে। হাত বাড়িয়ে অশোক ফোনটা তুলে নিলো। ওদিকের গলা শুনে বুঝলো গডার্ড। অশোক বিছানায় উঠে বসলো।

- কেমন আছ অশোক?
- ভালো। আপনারা?
- সবাই ভালো। তোমার এদেশে আট বছর হয়ে গেলো। কি করবে ভাবছো?
- আমি সামনের বছর দেশে ফিরে চাকরির চেষ্টা করবো।
- শোন, কলকাতার Indian Institute of Physical Science-এর ডিরেক্টর প্রফেসর চৌধুরী এখানে এসেছেন। ওদের ওখানে কিছু জায়গা খালি আছে। আমি তোমার কথা প্রফেসর চৌধুরীকে বলেছি।
- কলকাতা হলে আমার সুবিধা হয়।
- বেশ তাহলে একটা সিভি ওদের পাঠিয়ে দাও। রেফারি হিসাবে আমার, বেকার আর কোলম্যানের নাম দিয়ে দিয়ো। এ ছাড়া আরও দু-একজনের নাম যোগ করে দিতে পারো। ইতিমধ্যে তোমার এখানকার কাজ গোটাতে সুরু করে দাও। কবে নাগাদ তুমি কলকাতায় যাবার কথা ভাবছো?
- সামনের বছর এপ্রিল মাসে।
- বেশ। ওদের সব কাজ শেষ করতে মাস ছয়েক সময় লাগবে।

পরের বছর মার্চ মাসের ২৫ তারিখে মালপত্র নিয়ে অশোক লস এঞ্জেলেস এয়ারপোর্টে হাজির হলো। সে দিন পূর্ণিমা। আকাশ পরিষ্কার। থালার মতন করে চাঁদ উঠেছে। দিল্লি হয়ে প্লেন বদল করে কলকাতায় পৌঁছতে চব্বিশ ঘণ্টা লেগে যাবে। প্লেনের জানলা দিয়ে এয়ারপোর্টের আলো দেখতে দেখতে অশোক নিজেকেই বললো - আমেরিকায় পড়তে এসে অন্তত একটা লাভ হয়েছে, মা বাবা ছোট্ট একটা দু-কামরার বাড়ি করতে পেরেছেন।

(৬)

বিমলদা, বড় বিজ্ঞানীকে আজ প্যাঁচে ফেলে দিয়েছি - সলিল সেন হাসতে হাসতে বললেন। কি রকম - জানতে চাইলেন বিমল গুহ।

- এ বছর আমি পি-এইচ-ডি কোর্স কো-অরডিনেটর। ডিরেক্টর আমাকে বলেছেন যারা দু-বছর একই বিষয় পড়াচ্ছে তাদের বিষয় বদল করে দিতে। আমি বড় বিজ্ঞানীকে গিয়ে এ কথা বলে বললাম - তুমি এবার কি পড়াবে? সে বললো, যা দেবেন। আমি বললাম, তাহলে তুমি ইলেকট্রনিক্স পড়াও। ও বললো, ঠিক আছে।

- তুমি ভাবছো অশোক থিয়োরি করে বলে ইলেকট্রনিক্স দিয়ে খুব প্যাঁচে ফেলেছো তাই না? শোনো, একটা গল্প বলি। আজ থেকে অনেক বছর আগে একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের M.Scর খাতা দেখছিলাম পেপার থ্রি-বির। তোমাদের সময় কি ছিল ঐ পেপারে?

- ইলেকট্রনিক্স।

- ঠিক তাই। আমার কাছে একজন ৪৯ পেলো ৫০-এর মধ্যে। ৫০ দিলেও ক্ষতি ছিলো না। পরীক্ষকদের মিটিং-এ খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম ছেলেটির নাম অশোক কুমার মিত্র। সে বছর প্রায় প্রতি পেপারে হায়েস্ট পেয়ে ফার্স্ট হয়েছে।

- তাই নাকি?

- দাঁড়াও এখানে শেষ নয়। এর প্রায় বছর ছ-সাত পরে আমি মাদ্রিদে তিন মাসের জন্য গেছি। সঙ্গে লিলি মানে তোমার বৌদিও আছেন। ওর মধ্যে একটা ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স। আমারও একটা ইনভাটেড টক আর একটা সেশন চেয়ার করতে হবে। কনফারেন্সের মধ্যে একদিন খাবার টেবিলে প্রফেসর গডার্ডের সঙ্গে আলাপ হলো।

- গডার্ডের কাছে অশোক পি-এইচ-ডি করেছে না?

- ঠিক। আমি কলকাতা থেকে এসেছি শুনে জানতে চাইলেন অশোককে চিনি কিনা। আমি বললাম পরিচয় নেই। খাতা দেখার গল্পটা বললাম। গডার্ড বললেন কলকাতার আর একটি জিনিষ তার খুব ভালো লেগেছে। পরিষ্কার উচ্চারণে বললেন, মিষ্টি দই। বাড়ি গিয়ে তোমার বৌদিকে বললাম। তিনি বললেন, গডার্ডকে আমাদের ফ্ল্যাটে আসতে বলো, মিষ্টি দই খাওয়াব। গডার্ডকে বলতে রাজি হয়ে গেলেন। পরদিন গডার্ড আমাদের ফ্ল্যাটে এলেন। লিলি দই

পেতেছিলো। আর বানিয়েছিল কয়েক রকম ছানার মিষ্টি। গডার্ড বাঙালি খাবার দিয়ে ডিনার খেয়ে খুব খুশি হলেন।

- অশোককে নিয়ে কিছু কথা হলো?

- আরে সেটাই তো বলছি। গডার্ডের জবানিতে বলি। অশোক হার্ভার্ডে আসার পর ওকে আমি প্রথম সেমেস্টারে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইলেকট্রনিক্স কোর্স নিতে বলি। অশোক একটু আশ্চর্য হয়েছিলো, কিন্তু কিছু বলে নি। মাস দুয়েক পরে খবর পেলাম ল্যাবে যন্ত্র খারাপ হলে অশোক সেগুলি খুলে সারিয়ে ফেলছে। এক শনিবার আমি অশোককে ডিনারে ডেকে বিকেল পাঁচটার সময় আসতে বললাম গল্প করার জন্য। আমার স্ত্রী দুপুরে বাজারে বের হলে আমি টেলিভিশনটা খুলে একটা ঝাল আলগা করে দিলাম। তখন টেলিভিশনে শব্দ আসছে কিন্তু ছবি আসছে না। আমার স্ত্রী শনিবার সন্ধ্যা সাতটা থেকে আধ ঘণ্টা একটা সিরিয়াল দেখেন। ঐ সময় অন্য কোনো কাজ করেন না। সাড়ে ছটার সময় টিভি অন করে তিনি চেঁচাতে লাগলেন ছবি আসছে না। জেরি তোমাকে কতবার বলেছি টিভিটা পুরোনো হয়ে গেছে, ওটাকে বদলে ফেলো। তোমার কানে সে কথা যায় না। আমি ওকে উস্কে দেবার জন্য বললাম, পুরোনো হলে যদি বদল করতে হয় তাহলে আমাকে সবার আগে বদল করে ফেলো। এই শুনে মেরি আরও চেঁচাতে সুরু করলো। অশোক এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলো। এবার আমাকে বললো, আমি একটু খুলে দেখবো? আমি বললাম, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। আমি স্ক্রু ড্রাইভার, মিটার, আয়রন, সলডার এনে দিলাম। অশোক মিনিট দশেক এটা ওটা দেখলো। মিটার দিয়ে কয়েকটা রিডিং নিলো। দুবার দেওয়াল ঘড়ির দিকে তাকালো। আমি দূরে দাঁড়িয়ে দেখছি। তারপর আয়রন গরম করে একটা ঝাল ঠিক করে দিলো। পাওয়ার দিতে ছবি এসে গেলো। মেরি কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, খালি তো অঙ্ক কষো। একটা টিভি ঠিক করতে পারো না। তোমাকে কেন যে নোবেল প্রাইজ দেয় বুঝতে পারি না। এই ছেলেটা না থাকলে আজ কি হতো? আমার পেট ফেটে হাসি আসছে। কিন্তু হাসতে পারছি না। আমি বললাম একটা মেকানিক ডাকলে তাকে অন্তত কুড়ি ডলার দিতে হতো। মেরি বললো, তোমার যেমন বুদ্ধি! ছেলে কখনও মার কাছ থেকে ডলার নেয়? ক-দিন পর মেরি ডিপার্টমেন্টে গিয়ে অশোককে একটা Mechanic's Bag উপহার দিয়ে এলো। একজন মেকানিকের কাজ করতে মোটামুটি যা যা যন্ত্রপাতি লাগে সব এই ব্যাগে থেকে। আমি কায়দা করে দু-চার জনকে ঘটনাটা বললাম। কয়েকদিনের মধ্যে অশোকের নাম ছড়িয়ে পড়লো। শনি আর রবিবার টিভি, রেডিও আর টেপ সারিয়ে ভালো রকম আয় হতে লাগলো। অশোকের মাকে আমি যে কথা দিয়েছিলাম এখান থেকে যথেষ্ট ডলার দেশে পাঠাতে পারবে, সে কাজটা সহজ হয়ে গেলো।

- তাহলে বিমলদা আপনি বলছেন অশোক ইলেকট্রনিক্স ভালো জানে।

- শোনো সলিল, অশোক যদি ইলেকট্রনিক্স পড়ায় তাহলে আমি সেই ক্লাসগুলি করবো।

- সে কি? এই ইন্সটিটিউটে ইলেকট্রনিক্স-এর শেষ কথা আপনি। আর আপনি অশোকের ক্লাস করবেন?

- আমি নিশ্চিত অশোকের ক্লাস থেকে নতুন কিছু শিখতে পারবো। আর একটা কথা অশোক যদি তোমাকে বলে, সলিলদা আমি আপনার বিষয়টা নিলাম। আপনি আমারগুলি পড়াবেন? তাহলে তুমি কি অঙ্ক আর জেনারেল থিয়োরি পড়াবে?
- আমার কাজে জেনারেল থিয়োরি একদম লাগে না, আর অঙ্কের ব্যবহার খুব বেশি নেই।
- অশোকের কাজে ইলেকট্রনিক্স কোথায় লাগে? শোনো সলিল, এই যে তুমি আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে ডিরেক্টরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে অশোকের হাত মোচড়াবার চেষ্টা করছো এর ফল কিন্তু ভালো হবে না। তোমার হয়তো প্রাইজ হিসাবে অ্যাকাডেমির ফেলোশিপ জুটে যাবে কিন্তু একদিন তোমাদের মুখ পুড়বে। জানতো এক্সপেরিমেন্ট তিন রকম হয়। একটা করে মানুষ আর একটা করে যন্ত্র আর তৃতীয়টা করতে যন্ত্র লাগে না।
- সেটা কি রকম বুঝলাম না।
- এক ধরণের এক্সপেরিমেন্ট আছে সেখানে মানুষ যন্ত্র বানিয়ে অথবা দুটো যন্ত্র জুড়ে বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু মেপে একটা নতুন কথা বলে। আর এক ধরণের এক্সপেরিমেন্ট যেখানে একটা দামি যন্ত্র কিনে একটার পর একটা স্যাম্পল বসিয়ে ডেটা নিয়ে পেপার ছাপে। তার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ কিছুমাত্র থাকেনা। তৃতীয় ধরণের এক্সপেরিমেন্ট টেবিলে বসে কাগজ কলম দিয়ে সুবিধা মত ডেটা তৈরি করা হয়। আমাদের এখানে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী দ্বিতীয় দলের। ঘরে রেফ্রিজারেটর আর মাইক্রোওয়েভ থাকলে যদি বড় বিজ্ঞানী হওয়া যেতো, তাহলে নোবেল প্রাইজ না হলেও মাঝে মাঝে আমাদের এখান থেকে এক-আধজনের নাম অন্তত বিবেচনার জন্য উঠতো। আমাদের অনেক সহকর্মী বাড়ির সোফায় বছরে যে ক-ঘণ্টা বসেন তার চেয়ে বেশি সময় হোটেল, গেস্ট-হাউস বা এয়ারপোর্টের সোফায় সময় কাটান। কখন যে এরা লেখাপড়া করেন জানিনা। বিদেশে গেলে সাহেবদের সঙ্গে পেপার লেখেন অথচ দেশ থেকে সম্পূর্ণ নিজস্ব কাজ ভালো পত্রিকায় ছাপতে বড় একটা দেখা যায় না। যাকগে তোমায় এসব বলে আর কি হবে।

(৭)

অন্য দিনের মত আজকেও অশোক পৌনে নটার নাগাদ প্যার্কিং লটে গাড়িটা পার্ক করলো। চাবি দিয়ে দরজা বন্ধ করছে, ঠিক এমন সময় একটি ছেলে, মাথায় ক্রিকেটারদের মত টুপি, দ্রুত তার পাস দিয়ে যেতে যেতে বললো - স্যার, আজ আপনার ঘরে হামলা হবে। দরকারি কাগজপত্র সরিয়ে রাখবেন। ভালো করে বোঝার আগে ছেলেটি পরের গাড়ির পাস দিয়ে অন্য গাড়ির আড়ালে চলে গেলো। অশোক তার মুখ ঠিকমতো দেখতে পেলো না।

চাবি দিয়ে ঘরের দরজা খুলে অশোক নিজের ঘরে ঢুকলো। ঘরে একটা লোহার আলমারি। দুটো বই রাখার আলমারি। কোণে একটা ডেক্স-টপ কম্প্যুটার। প্রথমে বইগুলি টেবিল থেকে সরিয়ে বই-এর আলমারিতে রেখে আলমারির সব তাকগুলি চাবি দিয়ে বন্ধ করলো। গত

কয়েকদিন যা কাজ করেছিলো সেই কাগজপত্র লোহার আলমারিতে তুলে রাখলো। কিছু কম্প্যুটার আউটপুট যার এখন আর প্রয়োজন নেই, ঘরের কোণে কাঠের তাকে পড়েছিলো, সেগুলি টেবিলের উপর রাখলো। কম্প্যুটার অন করে ডাটা আর প্রোগ্রামগুলির ব্যাক-আপ চালিয়ে দিলো। টেবিলের বাঁ-দিকের দেওয়ালে গডার্ডের একটা ছবি ছিলো। সেটাকে নামিয়ে চেয়ারের পিছন দিকে যে তোয়ালেটা ছিলো তা দিয়ে ছবিটা মুছে যত্ন করে লোহার আলমারিতে তুলে রাখলো। আলমারির মাথার উপর রাখা কিছু পুরানো কাগজ ধুলো ঝেড়ে টেবিলের পরে রাখলো। শেষবারের মত ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে ব্রীফকেসটা আলমারির মধ্যে তুলে আলমারি বন্ধ করে চাবিটা ড্রয়ারে বাখলো। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলো ব্যাক-আপ শেষ হয়েছে। সিডিটাকে একটা খামে পুরে ড্রয়ারে রেখে ড্রয়ার বন্ধ করে চাবিটা প্যান্টের পকেটে রাখলো।

ঠিক এগারোটা পনেরোর সময় ফোন বাজলো। স্যার অ্যাকশন সুরু হতে যাচ্ছে। কিছু বলার আগে ফোন কেটে গেলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যে জনা পনেরো ছেলে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো। আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। বলো - অশোক বললো। আমরা জানতে এসেছি অভীকের এই দু-বছরে একটাও পেপার হলো না কেন?
-সেটা অভীককে জিজ্ঞাসা করতে পারো।
- এই সময় আপনার বেশ কয়েকটা পেপার হয়েছে। তাতে অভীকের নাম নেই কেন?
- কারণটা খুব সোজা। ঐ পেপারগুলিতে অভীক কিছু করে নি।
- তাহলে অভীকের পি-এইচ-ডি কি করে হবে?
- এক বছর আগে অভীককে তিনটি প্রবলেমের কথা বলেছি। তার যে কোন একটা করলেই পি-এইচ-ডি হয়ে যাবে।
- আমরা ওসব শুনতে চাই না। আপনি পেপারে অভীকের নাম দেবেন কিনা।
- অভীক কাজ করলে দেবো। আর আমি যে কাজ নিজে করবো তাতে দেবো না। অভীক নিজে কিছু করলে সে নিজের নামে পেপার লিখতে পারে।
ঠিক এই সময় অশোক লক্ষ্য করলো একটা ছেলে টেবিলের উপর রাখা কাঁচের গেলাস ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলো। তারপর ধুন্ধুমার কাণ্ড। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে এটা চললো। ঘর একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। কম্প্যুটারের মনিটরও রক্ষা পেলো না।

গণ্ডগোলের খবর পেয়ে কেউ এগিয়ে এলো না। বিমল গুহ ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে তুলতে খবরটা পেলেন। তাড়াতাড়ি ইন্সটিটিউটে ফিরে অশোকের ঘরে ঢুকে বললেন - ছি ছি কাঞ্চন আজ নিজেকে কোথায় নামিয়ে এনেছে।

অশোক আধঘণ্টা নিজের চেয়ারে চুপ করে বসে বইলো। তারপর ব্রীফকেস থেকে তার সবসময়ের সঙ্গী ছোট ক্যামেরাটা বার করে সারা ঘরের ছবি তুলতে সুরু করলো যতক্ষণ না ফিল্‌ম রোলটা শেষ হয়। ক্যামেরা থেকে ফিল্‌মটা বার করে পকেটে রাখলো। কালকে যে প্যাডটায় লিখছিল সেটা বার করলো। মাথায় কিছু আসছে না। কফির ফ্লাক্সটা মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। ফ্লাক্সটা খুলে দেখলো ভাঙেনি। এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। গ্লাস বা কফি-মগ একটাও আস্ত নেই। ফ্লাক্সের ঢাকনায় কফি ঢেলে আস্তে আস্তে চুমুক দিতে দিতে ভাবতে লাগলো এখন কি করা যায়। ডিরেক্টরকে চিঠি লিখবে? থানায় এফ-আই-আর করবে? কার সঙ্গে পরামর্শ করবে? লাঞ্চ প্যাকেটটা বার করলো। আজ সে নিজেই চিকেন স্যান্ডউইচ বানিয়ে এনেছে। স্যান্ডউইচ শেষ করে ঢক ঢক করে আধ বোতল জল খেয়ে ফেললো। এবার একটু স্বস্তি বোধ করছে। আবার প্যাডটা খুলে বসলো। সব তালগোল পাকিয়ে যাছে। মনে পড়লো গডার্ড বলেছিলেন, ভালো বিশ্ববিদ্যালয় মানে ভালো শিক্ষক, ভালো ছাত্র আর ভালো পরিবেশ। এই পরিবেশে কি এখানে ভালো কাজ করা সম্ভর? ঘড়িতে সাড়ে চারটা বাজে। একটা ব্যক্তিগত জিনিষের তালিকা তৈরি করলে কেমন হয়? তাতে ঘণ্টাখানেক কেটে যাবে।

ঠিক ছটার সময় অশোক ঘর থেকে বের হলো। অন্যদিন গা-তালা লাগিয়ে দরজা বন্ধ করে। আজ তার সঙ্গে হ্যাস-বোল্টটা টেনে একটা সাত লিভারের তালা ঝুলিয়ে দিলো। হাতে ব্রীফকেস ছাড়া ছটা বই। এই বইগুলি গডার্ড তাকে উপহার দিয়েছিলেন। সে প্রায় কুড়ি বছর আগেকার কথা। সোমা বম্বে থেকে বিকেলের ফ্লাইটে ফিরবে। সাতটার সময় প্লেন নামার কথা। অশোক এয়ারপোর্ট যাবার পথে স্টুডিওতে ফিল্‌ম রোলটা জমা দিলো।
- আধ ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করলে ছবিগুলি দিয়ে দিতে পারি। মেশিন খালি আছে।
- আমি এখন এয়ারপোর্ট যাচ্ছি। ফেরার সময় পারলে নিয়ে যাব। না হলে কাল আসব।

কি হলো তোমার - ডান দিকের রাস্তাটা ধরলে কেন? আমাদের বাড়ির রাস্তা তো বাঁ-দিকে - সোমা বললো। একটা ফিল্‌ম স্টুডিওতে দিয়ে এসেছি, সেটা নিয়ে যাই - অশোক বললো। সোমা বললো - কাল নিলে হত না? অশোক উত্তর দিলো - আজ নিলে ভালো হয়। এখুনি বাড়ি পৌঁছে যাব। ছেলেমেয়েরা হয়তো বসে আছে। চলো, আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করি - সোমা বললো।

তোমাকে আজ একটু অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে - সোমা বললো। অশোক বললো - আজ ডিরেক্টর আশীর্বাদ-ধন্য গুণ্ডাবাহিনী আমার অফিস ভাঙচুর করেছে। এই দেখো তার ছবি। সোমা মন দিয়ে ছবিগুলি দেখলো। কি করবে এখন - সোমা জানতে চাইলো। আজ রাতটা ভাবি, কাল দেখা যাবে - অশোক বললো।

- কাল রাতে অনেকবার উঠেছ। ভালো ঘুম নিশ্চয়ই হয় নি - সোমা বললো।

- তোমার সঙ্গে জরুরি পরামর্শ আছে।
- বলো।
- আমি ভাবছি এখানে আর কাজ করবো না। সোমবার অফিসে গিয়ে রিজাইন করবো।
- তারপর? এই মাফিয়াদের হাত খুব লম্বা।
- আমি ভাবছিলাম ..
- কি ভাবছিলে?
- অ্যাডাম হ্যারিস মাস চারেক আগে আমায় ফোন করে জানতে ছেয়েছিলো Cal Tech-এ একটা প্রফেসর পোস্ট খালি হচ্ছে আট মাস পর, আমি সেটা পেতে ইচ্ছুক কি না। আমি তখন না বলেছিলাম। অ্যাডাম এখন ডিপার্টমেন্টে চেয়ার প্রফেসর। ভাবছি অ্যাডামকে ফোন করে জিজ্ঞাসা করবো কিনা।
- তাহলে আমাদের সকলকে আমেরিকায় গিয়ে নতুন করে সংসার পাততে হবে। আমার অসুবিধা নেই। ওখানে কাজ জুটিয়ে নেবো। বাচ্চা দুটোর লেখাপড়ার অসুবিধা হতে পারে।
- বাচ্চা দুটো লেখাপড়ায় ভালো। দু-এক মাস অসুবিধা হলেও ওরা খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নেবে। তুমি ওখানে থাকতে পারবে কিনা বলো?
- আমি মানিয়ে নেব।
- এখন তো ক্যালির্ফনিয়াতে সন্ধ্যা, অ্যাডামকে ফোন করে দেখি।

তুমি সত্যি আসবে? তাহলে আমার কাজ সোজা হয়ে গেল। সামনের শুক্রবার আমরা সব দরখাস্ত নিয়ে বসবো। মাঝে মাঝে মনে হয় ভগবান সত্যিই আছেন। না হলে এই মুহূর্তে আমার ভাই ইয়ান কলকাতায় থাকবে কেন? ইয়ান অ্যামেরিকান এয়ারলাইন্সের জেনারেল ম্যানেজার। ব্যবসার কাজে কলকাতায় গেছে. হোটেল হিন্দুস্থানে আছে। আমি ওকে ফোন করে দিচ্ছি। তুমি ওর সঙ্গে কথা বলে নাও। ওর সঙ্গে সব কাগজ়পত্র পাঠিয়ে দাও। ইয়ান আমাদের মঙ্গলবার গভীর রাতে লস এঞ্জেলেস পৌঁছবে। আমি ইতিমধ্যে ফোন করে রেকো-গুলি আনিয়ে নিচ্ছি। বুধবারের মধ্যে সব কাগজপত্র তৈরি হয়ে যাবে। আমি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সোমবার কথা বলে নেব। বাকি সব কিছু আমার হাতে ছেড়ে দাও। কবে আসতে পারবে বলো - অ্যাডাম হ্যারিস কথা শেষ করলো।

(৮)

কলকাতার Indian Institute of Physical Science-এর ডিরেক্টর প্রফেসর কাঞ্চন মুখার্জি সকালে ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিলের বাঁ-দিকে রাখা ফাইলগুলির মধ্যে থেকে সবচেয়ে উপরের ফাইলটা নিয়ে খুললেন। সবে কয়েকটা লাইন পড়েছেন এমন সময় হুড়মুড় করে রেজিস্টার তালুকদার ঘরে ঢুকে পড়লেন। প্রফেসর মুখার্জি একটু আশ্চর্য হলেন। তালুকদার সবসময়

ফোন করে আসেন আর ঘরে ঢোকার আগে দরজায় টোকা দিয়ে থাকেন। প্রফেসর মুখার্জি বললেন - তালুকদার সাহেব খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?

- স্যার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

- কেন আবার কি হলো?

- আমাদের একটি ছাত্র প্রশান্ত সেন পোস্ট-ডকের জন্য আমেরিকার Stevens Institute of Technology-তে চিঠি লিখেছিলো।

- তাতে কি হয়েছে?

- আজ সকালের ডাকে আমি একটা চিঠি পেলাম Stevens-এর ডিন প্রফেসর পল রীডের কাছ থেকে। ডিন লিখেছেন, প্রফেসর মিত্রকে নিয়ে দুঃখজনক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা স্থির করেছি আগামী ছ-বছর আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে কোনও ছাত্রকে আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ দেবো না। আমাদের প্রতিষ্ঠান পড়াশুনার জন্য। এখানে হুলিগ্যানদের কোনও স্থান নেই। আমরা আরও স্থির করেছি, আপনাদের কোনও ফ্যাকাল্টির দেওয়া রেকো আমরা আগামী ছ-বছর বিবেচনায় আনব না। স্যার আমার মনে হয় আমাদের ছেলেরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

- হুঁ।

- রীড সাহেব এই চিঠির কপি আরও অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

- ব্যাপারটা বেশ চিন্তার বিষয়।

স্যার আসতে পারি - বিনয় দে দরজার ফাঁক দিয়ে মুখ বাড়ালো। এসো, প্রফেসর মুখার্জি বললেন।

- স্যার আজ সকালে বম্বে থেকে ফিরেছি। দু-দিন আগে আই-আই-টি বম্বেতে একটা ইন্টারভিউ ছিল। সেখানে চরম অপমানিত হতে হয়েছে। তালুকদার বললেন - সে কি? বিনয় বলতে সুরু করলো - আমাকে সবার আগে ডাকলো। ঘরে ঢুকে দেখলাম দশ বারো জন বসে আছেন। ডিরেক্টর আমার ফর্মটা পড়তে সুরু করলেন নাম, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি। সব শেষে বললেন, তুমি তো তোমাদের স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট? এটা কিন্তু ফর্মে লেখা ছিল না। তারপর ডানদিকে কোণে এক মাঝবয়সী ভদ্রলোককে বললেন, প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি আপনি জিজ্ঞাসা করুন। প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি একটা পেপার আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা তোমার পেপার? আমি ঘাড় নাড়লাম। একটা কাগজ এগিয়ে দিয়ে বললেন, ইকোয়েশন ১৬ থেকে ১৭ কেমন করে এলো দেখাও তো। আমি কয়েক মিনিট চেষ্টা করলাম। হলো না। ডিরেক্টর আর প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি চোখাচোখি করলেন। ডিরেক্টর বললেন পাশের ঘরে যাও। এটা করে নিয়ে এসো। ইতিমধ্যে আমরা অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলি। ঘণ্টা তিনেক পর আমার আবার ডাক পড়লো। প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি বললেন, দেখি কাগজটা। তারপর বললেন, এ তো কিছুই হয় নি। নিজের পেপারটার অঙ্কটাও কষতে পারো না। তারপর ডিরেক্টরকে বললেন,

টেলিফোনটা আমার দিকে এগিয়ে দেবেন? ফোনের স্পিকারটা অন করে ডায়াল করলেন। ওদিকের গলা শুনে বুঝলাম আমাদের প্রফেসর গাঙ্গুলি।
- কৃষ্ণমূর্তি বলছি। গাঙ্গুলি কেমন আছেন?
- ভালো আছি। আপনি?
- ভালো। আপনার মনে আছে পাঁচ ছ-মাস আগে আপনার একটা পেপার নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম?
- হ্যাঁ খুব মনে আছে। তারপর আমাদের কাজটা আরও এগিয়ে নিয়ে আপনি যে পেপারটা লিখেছেন সেটা পড়ছি। কাজটা খুব ভালো হয়েছে।
- আপনার হাতের কাছে পেপারটা আছে?
- দাঁড়ান, ফাইলটা খুলি। হ্যাঁ, পেয়েছি। বলুন।
- আপনার ছাত্র বিনয় এখানে ইন্টারভিউ দিতে এসেছে। ওকে ইকোয়েশন ১৬ থেকে ১৭ কেমন করে হলো দেখাতে বলেছিলাম। তিন ঘণ্টা চেষ্টা করেও পারেনি।
- খুবই দুঃখের। পেপারটা লিখে সমস্ত ক্যাল্কুলেশনের কাগজপত্র ওকে দিয়েছিলাম।
- ঠিক আছে। ধন্যবাদ। পরে কথা হবে।
এরপর প্রফেসর কৃষ্ণমূর্তি বললেন, তাহলে ডক্টর দে তোমার কি বলার আছে? আমি চুপ করে রইলাম। ডিরেক্টর জিজ্ঞাসা করলেন, এর পর কি তোমার পি-এইচ-ডি ডিগ্রিটা থাকা উচিত? গাইড কাজ করে পেপারে তোমাদের নাম দিয়ে পি-এইচ-ডি পাইয়ে দেবেন, এটাই তো তোমাদের দাবি। এইজন্য মিত্রর ঘরে ঢুকে ভাঙচুর করেছো? আমি বললাম, আমি তাদের দলে ছিলাম না। ছিলে না, কিন্তু ঘটনার নিন্দা করে কি বিবৃতি দিয়েছো? তুমি তো ঐ গুণ্ডা বাহিনীর নেতা - কৃষ্ণমূর্তি বললেন।
- প্রফেসর মিত্র লিখিত ভাবে কোনও অভিযোগ করেন নি।
- তুমি মনে করো মিত্র তোমার কাছে অভিযোগ করবেন আর তারপর তুমি ঘটনার নিন্দা করবে? তোমাদের ডিরেক্টরও এই ঘটনার নিন্দা করেন নি।
এবার ডিরেক্টর বললেন, শোনো আমি চার মাস হলো এখানে এসেছি। আরও বেশ কয়েক বছর এই চেয়ারে থাকবো। আমি যতদিন ডিরেক্টর থাকবো ততদিন তোমাদের ইন্সটিটিউট থেকে কাউকে আমার ইন্সটিটিউটে ঢুকতে দেবো না। তুমি ফিরে দিয়ে তোমার গুণ্ডা দলের সবাইকে একথা বলে দিয়ো। আমি আই-আই-টির ডিরেক্টর দের মিটিং-এ এটা তুলবো। আমার ফ্যাকাল্টি ভদ্রলোকদের জন্য, গুণ্ডাদের জন্য নয়। আমার এখানে এ-রকম ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে আমি এই সব গুণ্ডাদের ঘাড় ধরে গেটের বাইরে বার করে দিতাম। যাও। তোমাদের মতন ছেলেদের এখানে জায়গা নেই। স্যার আমাদের কি হবে? আমরা কি কোথাও চাকরি পাবো না? প্রফেসর মুখার্জি বললেন - তোমরা বোধহয় বাড়াবাড়ি করে ফেলেছো। পার্লামেন্টে একজন এম-পি এ ব্যাপারে একটা প্রশ্ন জমা দিয়েছেন। আমার কাছে উত্তরের জন্য এসেছে। গতকাল 'সকালের খবর' কাগজ থেকে দু-জন রিপোর্টার আমার কাছে এসেছিল। দেখলাম সব কাগজপত্র তারা জোগাড় করেছে। ভালো হোম ওয়ার্ক করে এসেছে। এমনকি

অশোকের চাকরি পাবার সময় যে পাঁচজন চিঠি দিয়েছিলেন তার কপিও ওদের কাছে আছে। এই পাঁচজনের মধ্যে আবার তিন জন নোবেল প্রাইজ পাওয়া। নিশ্চয়ই ভিতরের কেউ ওদের কাগজপত্র দিয়েছে। ওরা আমাকে শুনিয়ে গেল, অশোক তিনজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করেছে। এখন পর্যন্ত Physical Review Letters-এ উনত্রিশটা পেপার আছে। গত পাঁচ বছরে নেচার পত্রিকায় তিনটে পেপার ছেপেছে। ওরা আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট থেকে বার করেছে গত পাঁচ বছরে অশোক ছাড়া কেউ আমাদের এখান থেকে Physical Review Letters-এ পেপার ছাপে নি। অশোক এখান থেকে চারটে বই লিখেছে এবং সবগুলি বিদেশ থেকে বের হয়েছে। আমাকে বলতে পার হুমকি দিয়ে গেল এর পিছনে কারা আছে তাদের জানতে বাকি নেই। সকলের মুখোস খুলে দেবে। ছাত্ররা নিমিত্ত মাত্র। এইসব নানান ফেলোশিপ, প্রাইজ কে কিভাবে পায় তার খবরও ওদের কাছে আছে। মনে হয় ফলাও করে লিখবে। বিনয় বললো - কিন্তু স্যার আপনি এই ঘরে বসে প্রফেসর মিত্রকে টাইট দিতে বলেছিলেন। তখন রেজিস্টার আর প্রফেসর সেন আর প্রফেসর গুপ্ত এখানে ছিলেন।

- তোমার ভাঙচুর করতে গেলে কেন?

- ছেলেদের একবার উত্তেজিত করে দিলে সামলানো বেশ কঠিন। তাছাড়া আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম না।

তালুকদার বললেন - এখন তাহলে কি করা যায়? প্রফেসর মুখার্জি নিচু গলায় বললেন - কিছু তো একটা করতে হবে। দেখি প্রফেসর নাগার্জুন কি বলেন।

(৯)

মাসের তৃতীয় রবিবার বাড়ি পরিষ্কার করার দিন। সকালটা চলে যায় এই কাজ করতে। কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। একটি ছেলে গেট খুলে সদর দরজার সামনে দাঁড়ালো। অশোক তার দিকে তাকাতে সে বললো - স্যার আমার নাম সজল সাহা। আপনার কি আধঘণ্টা সময় হবে? অশোক বললো - তুমি ভিতরে এসে বসো। আমি হাত ধুয়ে আসছি। অশোক ভিতর থেকে দু-কাপ কফি এনে সজলের সামনে চেয়ারে বসে বললো - বলো কি ব্যাপার।

- স্যার, আমি অরগানিক কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টে প্রফেসর গুপ্তের কাছে কাজ করি। আমার অবশ্য আপনার ক্লাস করার সৌভাগ্য হয়নি। আমি আপনার অঙ্কের ক্লাসটা করতে চেয়েছিলাম। প্রফেসর গুপ্ত করতে দিলেন না। বললেন অরগানিক কেমিস্ট্রিতে অঙ্ক লাগেনা। সময় নষ্ট করার দরকার নেই। অশোক বাধা দিয়ে বললো - আচ্ছা তুমি কি সেদিন পার্কিং লটে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলে? সজল বললো - হ্যাঁ স্যার। অশোক বললো - সেদিন তোমার মুখটা ভালো করে দেখতে পাইনি। গলার স্বরটা চেনা মনে হলো। তোমার জন্য আমার দরকারি কাগজপত্রগুলি রক্ষা পেয়েছে। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। সজল বললো - সে দিনের ঘটনার সবটা না হলেও আমি অনেকটা জানি। আমার গাইড প্রফেসর গুপ্ত এর মধ্যে আছেন। আমরা পাশাপাশি ঘরে বসি। ওঘরে জোরে কথা বললে আমি শুনতে পাই। এ-ছাড়া রাতে কাজ

করতে হবে বলে আমি কয়েকদিন গেস্ট হয়ে হোস্টেলে ছিলাম। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে জনা সাতেক ফ্যাকাল্টি, ডিরেক্টর, রেজিস্টার আর আমাদের স্কলার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বিনয়দা আছেন। এদের মধ্যে আলাদা আলাদা করে বেশ কয়েকটা মিটিং হয়েছে ডিরেক্টরের ঘরে, হোস্টেলে আর প্রফেসর গুপ্তের ঘরে। শুনলে অবাক হবেন নির্দেশ এসেছে প্রফেসর গজানন নাগার্জুনের কাছ থেকে। এর বিনিময়ে আমাদের ইন্সটিটিউট থেকে সাত জন বিভিন্ন অ্যাকাডেমির ফেলো হবেন, বিনয়দাকে কোথাও একটা লেকচারার করে দেওয়া হবে আর প্রফেসর নাগার্জুনের আশীর্বাদে ডিরেক্টর আর একটা টার্ম পাবেন। লক্ষ্য করবেন ঘটনার সময় ষড়যন্ত্রের মাথারা কেউই ইন্সটিটিউটে ছিলেন না। ডিরেক্টর ও রেজিস্টার দিল্লিতে, প্রফেসর গুপ্ত সায়েন্স কলেজে, বিনয়দা সাহা ইন্সটিটিউটে আর প্রফেসর সেন শরীর খারাপ বলে বাড়িতে। আপনাকে একটা কথা বলি, ছাত্রদের মধ্যে জনা দশেক ছাড়া কেউ এটা সমর্থন করছে না। খবরের কাগজে লেখালেখির পর ব্যাপারটা অনেকদূর গড়িয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে প্রফেসর নাগার্জুন কলকাতায় আসছেন সামাল দেওয়ার জন্য। আপনি ঝপ করে রেজিগনেশন দেওয়ায় ডিরেক্টর বিপদে পড়ে গেছেন। অশোক বললো, তুমি এখানে এসেছো জানাজানি হলে বিপদে পড়বে না? সজল বললো - অবশ্যই। প্রফেসর গুপ্ত জানতে পারলে আমার ক্যারিয়ার শেষ করে দেবেন। অশোক বললো - তোমার যদি তেমন কোনো কাজ না থাকে তাহলে সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকো। আমাদের সঙ্গে দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম কর। সোমা এগিয়ে এসে বললো - সন্ধ্যার পর আমি তোমাকে গাড়ি করে একটু দূরে কোথাও নামিয়ে দিয়ে আসবো। আমাদের বাড়ির তিন কিলোমিটার রেডিয়াসের মধ্যে তোমাদের ইন্সটিটিউটের এর বেশ কয়েকজন থাকেন। তোমাদের স্যারের গাড়িটা তাদের কাছে পরিচিত। আমারটা ততটা নয়।

(১০)

আজকাল অশোককে প্রায় সকলেই এড়িয়ে চলে। তাই একটু অবাক হলো সকালবেলায় ডিরেক্টরের ফোন পেয়ে।

- অশোক, প্রফেসর নাগার্জুন কলকাতায় এসেছেন। সোনার বাংলায় আছেন। তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান। নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তুমি দেখা করে এসো।

- কাঞ্চনদা, আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। গত একমাসে আমার অনেকগুলি কাজের দিন নষ্ট হয়েছে। আর সাত দিনের মধ্যে আমার একটা লেখা ফিজিক্স রিপোর্টে ফাইনাল করে পাঠাতে হবে। তা ছাড়া আমার এই মুহূর্তে প্রফেসর নাগার্জুনের সঙ্গে কোনও দরকার নেই। ওনার যদি আমাকে দরকার থাকে তাহলে ওনাকে এখানে আসতে বলুন। আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারি।

- অশোক, মাথা গরম করো না। নাগার্জুন অত্যন্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তি। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শদাতাদের মধ্যে একজন। আমাদের দেশে বিজ্ঞান কোন পথে যাবে তা উনি ঠিক করেন। তাঁকে চটানো কি ঠিক হবে?

- কাঞ্চনদা, বিজ্ঞানটা কবজির জোরে হয় না। মাথা দিয়ে করতে হয়। যাইহোক আমি এ ব্যাপারে আর আলোচনা করতে চাই না।

ঘণ্টা দুয়েক পর দরজায় ঠিক দু-বার টোকা পড়লো। অশোক মুখ তুলে চাইলো। দরজা ঠেলে হাসিমুখে প্রফেসর গজানন নাগার্জুন ঘরে ঢুকে অশোকের ঠিক উল্টোদিকের চেয়ারে বসে পড়লেন।
- শুনলাম তুমি খুব ব্যস্ত। তাই আমি নিজেই চলে এলাম।
প্রফেসর নাগার্জুন মাথা ঘুরিয়ে ঘরটা দেখলেন। দেওয়ালের লম্বা কাঁচের বোর্ডটা আড়াআড়ি করে ফাটা। ছেঁড়া কাগজ ঘরের এক কোণে স্তূপ করে রাখা। টেবিলের উপরের কাঁচটা কোনাকুনি করে ভাঙা। চেয়ারের পিছনে ভাঙা মনিটরটা সে দিনের সাক্ষী হয়ে আছে।
- ছেলেরা খুব অন্যায় কাজ করেছে। আমি নিন্দা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। আমি বুঝতে পারছি তুমি রাগের মাথায় রেজিগনেশন দিয়েছিলে। তুমি ভারতীয় বিজ্ঞানের কথা ভেবে ওটা প্রত্যাহার করে নাও।
- আমি প্রায় দু-দিন ভেবে তারপর চিঠিটা দিয়েছি। প্রত্যাহার করার আর কোনো প্রশ্নই উঠে না।
- শোন, আমি এখানে আসার আগে তোমার নাম অ্যাকাডেমির জন্য প্রস্তাব করে দিয়ে এসেছি। তোমার একটা সিভি আমাকে দাও। আমি কাউকে দিয়ে ভাটনগরের প্রাইজ জন্য প্রস্তাব করিয়ে দেবো। এ বছর আমি কমিটির চেয়ারম্যান। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি তুমি এবার ভাটনগর প্রাইজ পাবে।
- প্রফেসর নাগার্জুন, আমার যাঁদের সঙ্গে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো আজ থেকে একশ বছর পরেও লোকে তাঁদের স্মরণ করবে। কারণ এঁরা যে পথ দিয়ে হেঁটে গেছেন তাঁদের পায়ের ছাপ সেখানে রয়ে গেছে। এঁদের সান্নিধ্যে আসার পর এই সব ফেলোশিপ, প্রাইজ আমার কাছে মূল্যহীন মনে হয়।
- আমি জানি তুমি তিনজন নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানীর সঙ্গে কাজ করেছো। আমি মাত্র পনেরো দিনের জন্য নোবেল প্রাইজ মিস করেছি। যাকগে সে সব কথা। তুমি কি মনে করো এখান থেকে বের হয়ে অন্য কোনো ইন্সটিটিউটে চাকরি নেবে? মনে রেখো আমার কথার অবাধ্য হলে কেউ তোমাকে চাকরি দিতে সাহস করবে না।
- আপনি বোধহয় জানেন না যে আমার স্ত্রী একজন নামি আর্কিটেক্ট। একটা মাল্টিন্যাশনাল কম্পানির ভাইস প্রেসিডেন্ট। এ শহরের বাইরেও তার পরিচিতি আছে। তাঁর আয় আমার আয়ের চেয়ে অনেক বেশি। তাই কোথাও চাকরি না পেলেও না খেয়ে মরবো না। ঘণ্টাখানেক আগে আমার স্ত্রী দিল্লি থেকে ফোন করেছিলেন। ওদের কম্পানি রাষ্ট্রপতি ভবনের একটা অংশের রিনোভেশনের কাজ পেয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিটিং চলছে, তার পছন্দ-অপছন্দ বুঝে নেবার জন্য। আর একটা কথা। আমি স্কুল থেকে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত ফিজিক্স, ম্যাথস-এর সব কিছু পড়াতে পারি। হার্ভার্ডে আমি ফিজিক্স এর চেয়ে ম্যাথস-এর কোর্স বেশি

নিয়েছিলাম। একটা কোচিং ক্লাস খুললে কেমন হয়? তখন আপনার দু-একজন ছাত্রকে পাঠিয়ে দেবেন। প্রফেসর নাগার্জুন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন - বেশ এই তাহলে তোমার শেষ কথা। আমি মুখার্জিকে বলছি তোমার রেজিগনেশন গ্রহণ করে নেবার জন্য। অশোক বললো - তাহলে আমার একটা উপকার করবেন? আমার বেশ কিছু ছুটি পাওনা আছে। প্রফেসর মুখার্জিকে বলবেন সেগুলির সঙ্গে কাটাকাটি করে যদি আমাকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়। বলতে ভুলে গেছি হার্ভার্ডে আমি দুটো ফোটোগ্রাফির কোর্স নিয়েছিলাম। একটা স্টুডিও করার কথা ভাবা যেতে পারে। তখন আপনার একটা বড় ছবি ডিসপ্লেতে নিশ্চয়ই থাকবে।

(১১)

মে মাসের শেষ দিন। প্রফেসর মিত্র আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা থেকে অবসর নেবেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তেত্রিশ বছর হয়ে গেলো। দুপুর বেলায় ফ্যাকাল্টি লাঞ্চ ছিলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট নিজে এসেছেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ ও আমার পক্ষ থেকে প্রফেসর অশোক কুমার মিত্রকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আজীবন এমারিটাস প্রফেসর হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি - প্রেসিডেন্ট বললেন। উপস্থিত সকলে হাততালি দিয়ে সমর্থন জানালো।

প্রফেসর মিত্র ব্রীফকেসটা তুলে নিলেন। শেষবারের মত নিজের ঘরের চারদিক দেখলেন। এই ঘরেই তাঁর তেত্রিশ বছর কেটেছে। চেয়ার প্রফেসর মিল্টন এগিয়ে এসে প্রফেসর মিত্রর হাত থেকে ব্রীফকেসটা নিয়ে বললেন - আজকের দিনে ব্রীফকেসটা আমাকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে দিন।

প্রফেসর মিত্র সদর দরজার সামনে দাঁড়ালেন। একটি ছাত্রী এগিয়ে এলো - প্রফেসর, আপনার গাড়ির চাবিটা দিন। আমি পার্কিং লট থেকে গাড়িটা এখানে নিয়ে আসছি। বাড়ির সামনে সমস্ত ফ্যাকাল্টি আর ছাত্র-ছাত্রীরা লাইন করে দাঁড়িয়েছে। প্রফেসর মিত্র গাড়িতে উঠে সবার উদ্দেশে হাত তুললেন, তারপর ভারতীয় প্রথায় হাত জোর করে নমস্কার করলেন। গলাটা কেমন ভারি ভারি ঠেকছে। চোখটা কি একটু ঝাপসা লাগছে? প্রফেসর মিত্র অ্যাক্সিলারেটারে চাপ দিলেন। গাড়ি চলতে সুরু করলো।

July, 2011